প্যারালাল TEXT

(For HSC & Pre-Admission)

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়: প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস বায়োলজি টিম

প্রচ্ছদ
মোঃ রাকিব হোসেন

অক্ষর বিন্যাস
শিহাব মাহামুদ ও ইলিয়াস হোসেন

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০২৩ ইং
সর্বশেষ সংস্করণ: আগস্ট, ২০২৩ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনও উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

তোমরা শিক্ষা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পদার্পণ করেছো। মাধ্যমিকের পড়াশুনা থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশুনার ধাঁচ ভিন্ন এবং ব্যাপক। মাধ্যমিক পর্যন্ত যেখানে 'বোর্ড বই'-ই ছিল সব, সেখানে উচ্চ-মাধ্যমিকে বিষয়ভিত্তিক নির্দিষ্ট কোন বই নেই। কিন্তু বাজারে বোর্ড অনুমোদিত বিভিন্ন লেখকের অনেক বই পাওয়া যায়। একারণেই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দ্বিধায় ভোগে। এছাড়া, মাধ্যমিকের তুলনায় উচ্চ-মাধ্যমিকে সিলেবাস বিশাল হওয়া সত্ত্বেও প্রস্তুতির জন্য খুবই কম সময় পাওয়া যায়। জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ধাপের শুরুতেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে আমাদের এই Parallel Text। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের হতাশার একটি মুখ্য কারণ থাকে পাঠ্যবইয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা বুঝতে না পারা। এজন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বুঝে বুঝে পড়ার প্রতি অনীহা তৈরি হয়। তারই ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা HSC ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়।

তোমাদের লেখাপড়াকে আরও সহজ ও প্রাণবন্ত করে তোলার বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের Parallel Text বইগুলো সাজানো হয়েছে সহজ-সাবলীল ভাষায়, অসংখ্য বাস্তব উদাহরণ, গল্প, কার্টুন, চিত্র ও Flowchart দিয়ে; যা টপিকের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি পরবর্তী টপিকগুলোও বুঝতে সাহায্য করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য ইত্যাদি নির্দেশকের মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে। এছাড়াও যেসব বিষয়ে সাধারণত ভুল হয়, সেসব বিষয় 'সতর্কতা'র মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

তবে শুধু বুঝতে পারাটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়, তার পাশাপাশি দরকার পর্যাপ্ত অনুশীলন। আর এই বিষয়টি আরও সহজ করতে প্রতিটি অধ্যায়ের কয়েকটি টপিক শেষে যুক্ত করা হয়েছে 'টপিকভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান'। যার মধ্যে বিগত বোর্ড পরীক্ষার পাশাপাশি রয়েছে মেডিকেল, ডেন্টাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান। এভাবে ধাপে ধাপে অনুশীলন করার ফলে তোমরা বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ প্রস্তুতির পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে পারবে এখন থেকেই। এছাড়াও অধ্যায় শেষে রয়েছে 'গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম' যা অনুশীলনের মাধ্যমে তোমাদের প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হবে।

আশা করছি, আমাদের এই Parallel Text একই সাথে উচ্চ মাধ্যমিকে তোমাদের বেসিক গঠনে সহায়তা করে HSC পরীক্ষায় A+ নিশ্চিত করবে এবং ভবিষ্যতে মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখবে।

তোমাদের সার্বিক সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনায়-

উদ্ভাস বায়োলজি টিম

সূচিপত্র

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়: প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

ক্র.নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	প্রাণিবৈচিত্র্য	০১
০২	প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস	০৩
০৩	টপিকভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান	১৭
০৪	ননকর্ডেট	২১
০৫	টপিকভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান	৩৪
০৬	কর্ডাটা	৩৮
০৭	টপিকভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান	৫৩
০৮	গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম	৫৭

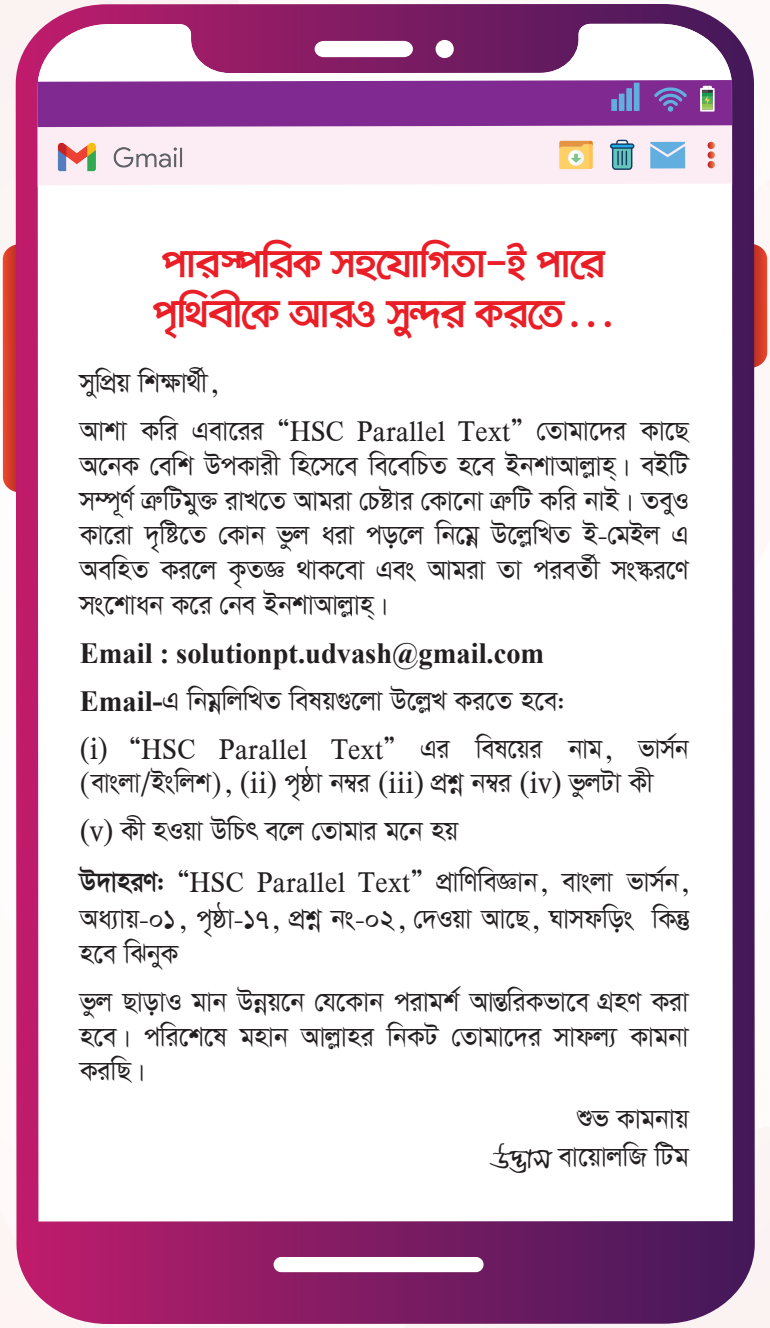

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি এবারের "HSC Parallel Text" তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নাই। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লেখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionpt.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) "HSC Parallel Text" এর বিষয়ের নাম, ভার্সন (বাংলা/ইংলিশ), (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী

(v) কী হওয়া উচিৎ বলে তোমার মনে হয়

উদাহরণ: "HSC Parallel Text" প্রাণিবিজ্ঞান, বাংলা ভার্সন, অধ্যায়-০১, পৃষ্ঠা-১৭, প্রশ্ন নং-০২, দেওয়া আছে, ঘাসফড়িং কিন্তু হবে ঝিনুক

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোন পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস বায়োলজি টিম

অধ্যায় ০১

প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস

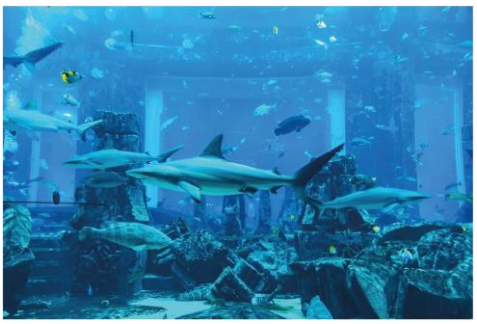

ভ্রমণপিপাসু ডা. আসিফ প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশে ঘুরতে যান। Covid-19 এর জন্য দুই বছর ঘোরাঘুরি বন্ধ রাখার পর আবার তিনি তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা শুরু করলেন। এইবছর তিনি তার ছোট ভাই রাফিদকে সাথে নিয়ে দুবাই যাবার পরিকল্পনা করলেন। তো যেই চিন্তা-সেই কাজ। তাদের ভ্রমণের ৩য় দিন তারা চলে গেলেন Dubai Aquarium & Underwater Zoo পরিদর্শন করতে। সেখানে প্রবেশ করে সামুদ্রিক প্রাণিসমূহ নিয়ে তাদের ধারণাই যেন পাল্টে গেল। ঠিক যেন সিনেমায় বা টিভিতে দেখা সেই সামুদ্রিক প্রবাল, জেলিফিশ, অক্টোপাস, স্টারফিশ, হাঙ্গর, স্টিং রে সহ আরও বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী। এখানে ঘোরাঘুরি শেষ করে তারা যখন হোটেলে ফিরে গেল তখন আসিফ দেখলো রাফিদ ফ্রেশ হয়ে মোবাইলে আজকের দিনের ছবিগুলো দেখছে। রাফিদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আজকে আমরা তো অনেকগুলো প্রাণী দেখলাম এবং একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম, আমরা যে মাছ খাই তার সাথে হাঙ্গরের অনেকগুলো মিল থাকলেও হাঙ্গরের মুখের পিছনে যে দাগের মতো অংশ দেখেছি তা কিন্তু রুই বা ইলিশ মাছে দেখি না, বরং এখানে কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে।"

আসিফ বলল, "তোর বিচক্ষণতা কিন্তু অনেক ভালো। শুধু এদের মধ্যে না, আজকে যে জেলিফিশ দেখলি তা কিন্তু কোনোভাবেই মাছ না আবার তা দেখতেও অক্টোপাসের কাছাকাছি মনে হতে পারে কিন্তু আসলে এদের মধ্যে অনেক দূরত্ব".....

আসিফ ও রাফিদের এই কথোপকথনে তোমরা কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছ সমুদ্রে যারা বসবাস করে তাদের কত ভিন্নতা, কত বৈচিত্র্য। আর শুধু সমুদ্র না এই ভিন্নতা বিরাজ করে সারা পৃথিবীজুড়ে। এত ভিন্নতা সত্ত্বেও কিছু প্রাণী আবার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অনেক কাছাকাছি অথচ অন্য প্রাণিগোষ্ঠী বা পর্ব থেকে অনেক দূরে। তো চলো, এবার আমরা সৃষ্টিকর্তার সুনিপুণ সৃষ্টি বিশাল এই প্রাণিজগতের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করি।

প্রাণিবৈচিত্র্য

তুমি যদি একটু খেয়াল করে তোমার চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহ লক্ষ করো তবে বুঝতে পারবে কেবল একটি বা দুটি প্রজাতি নিয়ে আমাদের পরিবেশ গড়ে উঠেনি, নানা জাতের নানা প্রকারের বিভিন্ন সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমন্বয়েই পরিবেশ। সব জীব আবার সব জায়গায় থাকে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব পরিবেশ আছে যার বাহিরে তার অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। আবার, মানুষ একই প্রজাতির ও একই পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের বিস্তর পার্থক্য। এই বিভিন্নতাই বৈচিত্র্য। সুতরাং প্রাণিসমূহের বিভিন্নতাই প্রাণিবৈচিত্র্য আর উদ্ভিদসমূহের মাঝে যে বিভিন্নতা বিদ্যমান তা হলো উদ্ভিদবৈচিত্র্য। এদের একত্রে জীববৈচিত্র্য বলে। **জীববৈচিত্র্য যেসব এলাকায় বেশি দেখা যায় সেসব এলাকাকে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট বলে।**

পৃথিবীর সমস্ত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুসংস্থানগত বিভিন্নতা দেখা যায় সেটিই হচ্ছে প্রাণির বিভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য।

প্রাণিবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

প্রাণিবৈচিত্র্য ৩ প্রকার: (i) জিনগত বৈচিত্র্য (ii) প্রজাতি বৈচিত্র্য (iii) বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য

জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity)

একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে একই প্রজাতির সদস্যসমূহের মধ্যে জিনগত উপাদানে যে পার্থক্য রয়েছে, তাকে জিনগত বৈচিত্র্য বলে।

জিনগত সাধারণ গঠন বা কোড এর বিভিন্নতার দরুণ এ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। পাশের চিত্রটির দিকে লক্ষ কর। সিংহ দুটি একই প্রজাতির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র জিনগত ভিন্নতার জন্য এদের লোমের রঙ কিন্তু ভিন্ন।

ঠিক একইভাবে সকল মানুষ (*Homo sapiens*) একই প্রজাতিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষের জিনগত ভিন্নতার কারণেই প্রজাতিতে উপ-প্রজাতি (Sub-Species), রেস (Race), জাত (Variety) প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ এর একজন মানুষের শারীরিক গঠন, আকার, আকৃতি, চুলের রঙ, চোখের রঙ কিন্তু একজন আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির সাথে মিলবে না। এই পার্থক্যের পিছনে আমাদের কোষে থাকা ডিএনএ এর সুনির্দিষ্ট খণ্ডগুলোর বিভিন্নতাই দায়ী । খেয়াল করো, জিনগত বৈচিত্র্য কিন্তু একই প্রজাতির সদস্যদের মাঝেই থাকে, তাই একে আমরা অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য বলি । জিনগত বৈচিত্র্য বেশি থাকলে অভিযোজন ক্ষমতা বেশি হয়। পৃথিবীর এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে শুধু তারাই যাদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশি। তাহলে চিন্তা করো তো, জিনগত বৈচিত্র্য বেশি থাকা ভালো নাকি কম থাকা ভালো?

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species Diversity)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন প্রজাতির অর্থাৎ একটি বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাণীদের মধ্যকার বৈচিত্র্যকে বলা হয় প্রজাতিগত বৈচিত্র্য। **এটি জীববৈচিত্র্যের একটি মৌলিক ধাপ**। প্রজাতিগত বৈচিত্র্য দুই প্রকার, যথা: অন্তঃপ্রজাতিক (নিজ প্রজাতির মধ্যে) এবং আন্তঃপ্রজাতিক (ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে)।

প্রজাতিবৈচিত্র্যে ভাইরাসসহ পৃথিবীর সকল প্রজাতির জীব অন্তর্ভুক্ত। সব অঞ্চলেই কিন্তু প্রজাতিবৈচিত্র্যের মাত্রা এক নয়। মরু ও মেরু অঞ্চলের চেয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের মাত্রা বেশি। আর যে অঞ্চলে প্রজাতিবৈচিত্র্য বেশি সেই অঞ্চল সাধারণভাবে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট হিসেবে পরিচিত।

জেনে রাখো

জীববৈচিত্র্যের হটস্পট (The Biodiversity Hotspots):

1988 সালে ব্রিটিশ পরিবেশবিদ Ernst Norman Mayr প্রথম "The Biodiversity Hotspots" শব্দটি প্রচলন করেন। পৃথিবীর সকল স্থানে জীববৈচিত্র্য এক রকম নয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে পৃথিবীর যে অঞ্চলগুলোতে জীববৈচিত্র্য (মূলত প্রজাতিবৈচিত্র্য) অধিক তাকে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট বলা হলেও হটস্পট নির্ধারণের কিছু মাপকাঠি রয়েছে। সেই অঞ্চলকে হটস্পটের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয় যে অঞ্চলে ন্যূনতম 1500 টি এন্ডেমিক ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে, অঞ্চলটির প্রকৃত বসতির (Original Habitat) অন্তত: 70% বিনষ্ট হয়েছে এবং অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্তত: 0.5%। বর্তমানে পৃথিবীতে 25 টি হটস্পট রয়েছে। এসব হটস্পটের মোট আয়তন পৃথিবী পৃষ্ঠের মাত্র 1.4% এবং পৃথিবীর সকল ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির 44% ও সকল স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতির 35% প্রজাতি বসবাস করছে এসব হটস্পটগুলোতে।

বাংলাদেশের হটস্পট: সমগ্র সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, ইন্দো-বার্মা হটস্পটের অন্তর্গত।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem Diversity)

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ ও পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে সংযুক্ত বিভিন্ন জীবসম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতাকে (জিনগত ও প্রজাতি বৈচিত্র্য) বোঝায়।

একই বা একাধিক প্রজাতির একদল জীব যে স্থানে থাকে সেখানে বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বাস্তুতন্ত্র রয়েছে। যেমন: তৃণভূমি, বনভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি। এক বাস্তুতন্ত্রের জীব অন্য বাস্তুতন্ত্রে বাস করতে পারে না। যেমন: পাশের চিত্রে তোমরা শ্বেত ভাল্লুক দেখতে পাচ্ছ। শ্বেত ভাল্লুক দেখা যায় উত্তর মেরুর বরফাবৃত এলাকায়। একে যদি উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে নিয়ে আসা হয় তবে তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পরবে কেননা সে উত্তরমেরুর শীতল পরিবেশের সাথেই অভিযোজিত।

অর্থাৎ বুঝতেই পারছ, প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। আর এই বিভিন্নতাই বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

কলেজশিক্ষার্থী সাফিন একবার তার গ্রামের বাড়িতে ঈদের ছুটি কাটাতে চলে গেলো। এবারের এই যাত্রা তার অনেক দিন মনে থাকবে, কেননা এবার সে এক অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। স্কুল পড়ুয়া তার এক ছোটভাই কথা প্রসঙ্গে তাকে বলল সে নাকি ধরে নিয়েছে, তেলাপোকা যেহেতু উড়তে পারে তাই তেলাপোকার সাথে কোনো না কোনোভাবে পাখির সম্পর্ক থাকতেই হবে। এইতো সাফিন পেয়ে গেলো লেকচার দেয়ার সুযোগ। সে বলতে লাগল, বিশাল বৈচিত্র্যময় এই প্রাণিজগতের মাঝে পাখিকে আলাদা করার চেষ্টা করা যাক। তুমি প্রথমেই বলবে পাখিটিকে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া কিংবা উদ্ভিদ থেকে আলাদা করে ফেলবে। এরপর তোমার চিন্তা মাথায় আসবে এর পিছনে শক্ত কাটার মতো অংশ থাকায়, এটি অবশ্যই তেলাপোকা বা এজাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে আলাদা হবে। এরপর তুমি সহজেই মেরুদণ্ডী প্রাণীসমূহের মধ্যে মাছ, ব্যাঙ, এমনকি মানুষ থেকেও এই পাখির প্রজাতি আলাদা করে ফেলবে।

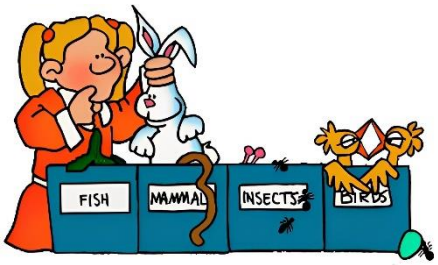

এই যে বিশাল এই প্রাণিজগতের মধ্য থেকে পাখিকে তুমি আলাদা করে ফেললে এই পদ্ধতিটিই হলো প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস।

> পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী প্রাণিকূলকে গোষ্ঠীভুক্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে।

এই শ্রেণিবিন্যাস কিন্তু নতুন কোনো প্রচেষ্টা নয়। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের হাত ধরেই এর যাত্রা শুরু। এরিস্টটলকে বলা হয় প্রাণিবিদ্যার জনক। তিনিই প্রথম প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করে প্রাণিকূলকে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে উদ্যোগী হন। তিনি রক্তের ভিত্তিতে প্রাণীজগতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন,

(i) **Enaima**: লালরক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী। Enaima-কে প্রজনন প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ডিম্বজ (যারা ডিম পাড়ে, যেমন: মাছ, উভচর, সরিসৃপ ও পাখি) এবং জরায়ুজ (যারা সন্তান প্রসব করে, যেমন: স্তন্যপায়ী) এ রকম দুটি দলে ভাগ করা হয়।

(ii) **Anaima:** লালরক্তবিহীন অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পরবর্তীতে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের যেমন রয়েছে তাত্ত্বিক বা গবেষণামূলক প্রয়োজনীয়তা, তেমনি রয়েছে ফলিত বা ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা।

(i) তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা:

- শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কোনো প্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে ওই গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।
- কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণিজগতের অনেক সদস্য সম্পর্কে জানা ও শেখা যায়।
- প্রাণিকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও জাতিজনির বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।
- প্রাণিকূলের বিবর্তনিক ধারা নির্ণয়ে সাহায্য করে।
- নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য।

(ii) ফলিত প্রয়োজনীয়তা:

- জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও বনের ক্ষতিকর প্রজাতি দমনের উদ্দেশ্যে শ্রেণিবিন্যাস নির্দিষ্ট প্রজাতির সঠিক পরিচয় দান করে।
- অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণী বাছাই করা যায়।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য করে।
- ভূতত্ত্বীয় ঘটনাবলির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্য প্রয়োজন।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের পশুপাখি উদ্ভাবন সহজতর হয়।

এজন্য অনেক আগে থেকেই প্রাণীকে শ্রেণিবিন্যাসের আওতায় আনার প্রচেষ্টা চলেছিল। সামগ্রিকভাবে জীবজগৎকে (উদ্ভিদ ও প্রাণিসহ) সর্বাধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের আওতায় আনেন Margulis এবং Whittaker ১৯৬৯ সালে। তাদের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ:

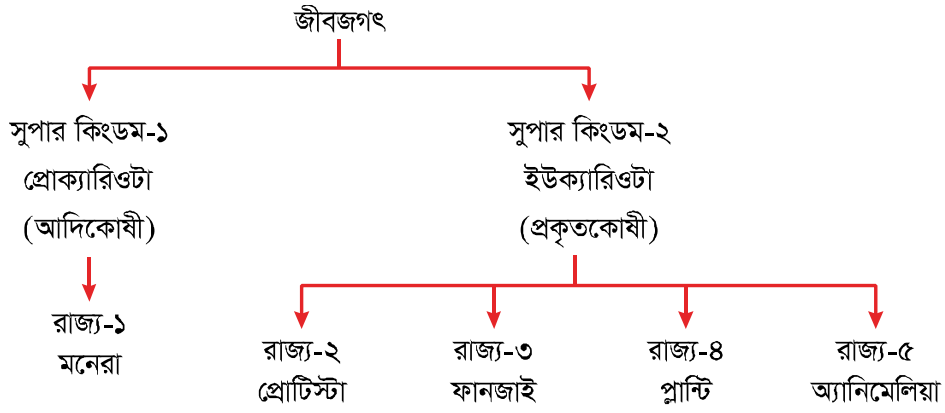

এই বিস্তৃত শ্রেণিবিন্যাসের কেবল Kingdom-5 বা Animalia রাজ্যের আলোচ্য বিষয় হলো প্রাণিজগৎ। প্রাণিজগতের সকল সদস্য Animalia রাজ্যের অন্তর্গত। প্রাণিজগতের প্রতিটি সদস্যকে পৃথক শ্রেণিকরণের আওতায় আনতে সর্বপ্রথম দ্বিপদ নামকরণের প্রবর্তন করে বিজ্ঞানী Carolus Linnaeus। তাই তাঁকেই বলা হয় শ্রেণিবিন্যাসের জনক। শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয় শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা (Taxonomy) তে। এই শ্রেণিবিন্যাস কিন্তু একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া, যা করা হয় প্রাণীসমূহের কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি ধরে। চলো শ্রেণিবিন্যাসের এই ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে জেনে আসা যাক।

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস এর ভিত্তি

i. দেহের আকার	v. ভ্রূণস্তর	ix. উপাঙ্গ	xiii. সংবহনতন্ত্র
ii. সংগঠন ক্রমমাত্রা	vi. প্রতিসাম্য	x. প্রান্তিকতা	xiv. কঙ্কাল
iii. জীবন পদ্ধতি	vii. খণ্ডকায়ন	xi. তল	xv. নটোকর্ড
iv. ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ	viii. অঞ্চলায়ন	xii. সিলোম	xvi. পৌষ্টিকনালি

দেহের আকার

(ক) আণুবীক্ষণিক প্রাণী	ক্ষুদ্র প্রাণী যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না।	*Trichodina anabasi* (মাছের ফুলকার প্রোটিস্টান জীবাণু)
(খ) বৃহত্তর প্রাণী	আকারে বড়, খালি চোখে দেখা যায়।	*Cavia porcellus* (গিনিপিগ)

সংগঠন ক্রমমাত্রা

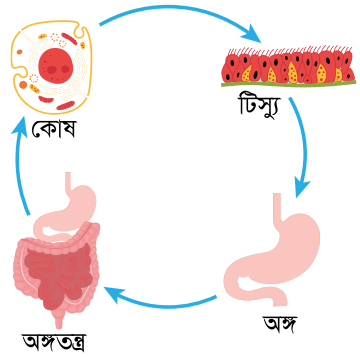

প্রাণী দেহকোষ, টিস্যু, অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র নিয়ে গঠিত কিনা তা এই সংগঠন ক্রমমাত্রা দিয়ে নির্ধারণ করা যায়। আমরা তো জানি জাইগোট থেকেই সকল প্রাণীর যাত্রা শুরু, এরপর এই জাইগোটের মাইটোসিস বিভাজনের দ্বারা বহুকোষী গঠন লাভ করে (এই বহুকোষী গঠন কিন্তু Animalia এর অনন্য বৈশিষ্ট্য)।

যদি তোমরা মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করো তাহলে, মানুষের ক্ষেত্রে এই কোষসমূহ একসাথে সংগঠিত হয়ে তৈরি করে টিস্যু, একাধিক টিস্যু সংগঠিত হয়ে তৈরি করে অঙ্গ, আর একাধিক অঙ্গ মিলে একটি তন্ত্র বা System গঠন করে। কিছু প্রাণী আছে যা শুধু কোষ দিয়ে গঠিত কিন্তু কোনো টিস্যু তৈরি করে না কাজেই অঙ্গ তৈরির প্রশ্নই নেই। আবার কিছু প্রাণী কোষের পর টিস্যু গঠন করে কিন্তু অঙ্গ আর গঠিত হয় না। এভাবেই কিছু প্রাণী অঙ্গের সমষ্টি আবার কিছু প্রাণীতে উন্নত গঠনের তন্ত্র পাওয়া যায়। খেয়াল করে দেখো এই যে সংগঠন মাত্রার ভিত্তিতে আমরা কিন্তু প্রাণীজগতকে খুব সহজেই ৪টি ভাগে বিভক্ত করে ফেললাম।

(ক) কোষীয় মাত্রার গঠন	কিছু কোষ সংঘটিত হয় নির্দিষ্ট কাজ করে। এখানে কোষের কাজ সুনির্দিষ্ট থাকে তাই এরা কোষীয় মাত্রার প্রাণী।	Porifera
(খ) কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন	একই ধরনের কোষগুলো মিলে অভিন্ন কাজ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজানো থাকে ও টিস্যু তৈরি করে।	Cnidaria
(গ) টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন	টিস্যু দ্বারা তৈরি বিভিন্ন অঙ্গ (যেমন চক্ষুবিন্দু, প্রবোসিস, জননাঙ্গ ইত্যাদি) নিয়ে প্রাণীর গঠন।	Platyhelminthes
(ঘ) অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন	অঙ্গগুলো একত্রে কিছু কাজ করার জন্য তন্ত্র (যেমন সংবহন তন্ত্র, শ্বসন তন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র ইত্যাদি) গঠন করে এবং পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় করে দেহকে সর্বোচ্চ মাত্রা গঠনে উন্নত করেছে।	Nematoda থেকে Chordata পর্যন্ত

চিত্র: বিভিন্ন সংগঠন মাত্রার প্রাণী

জেনে রাখো

প্রবোসিস:
প্রবোসিস দেখা যায় টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠনের প্রাণীতে। প্রবোসিস বলতে মূলত বোঝায় লম্বা বর্ধিত মুখোপাঙ্গ যা চোষক হিসেবে কাজ করে।

চক্ষুবিন্দু:
চক্ষুবিন্দু ও টিস্যু অঙ্গমাত্রার অন্যতম অঙ্গ। চক্ষুবিন্দু হলো চোখের মতো দেখতে আলোক সংবেদী, পিগমেন্টসমৃদ্ধ অঙ্গ, যা আলোর প্রতি সাড়া দিয়ে ফটোট্যাক্সিসে ভূমিকা রাখে। অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে কৃমি, তারামাছ প্রভৃতিতে চক্ষুবিন্দু দেখা যায়।

জীবন পদ্ধতি

মুক্তজীবী	স্বাধীন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচর্যে বাস করে না।	কবুতর (*Columba livia*)
পরজীবী	কোন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে ও খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে।	যকৃত কৃমি (*Fasciola hepatica*), গোলকৃমি (*Ascaris lumbricoides*)

তল

প্রতিসম প্রাণীকে সদৃশ অংশে ভাগ করা সম্ভব । একটা রেখা বরাবর দেহকে বাম-ডান (অনুদৈর্ঘ্য/মধ্যরেখীয়), সম্মুখ-পশ্চাৎ (অনুপ্রস্থ) ও অঙ্কীয় পৃষ্ঠীয় (সম্মুখ তল) ভাগ করা যায়। এই অঞ্চলকে তল বলে ।

মধ্যরেখীয় তল (Median or Sagittal)	দেহকে সদৃশ ডান ও বাম অংশে ভাগ করে ।
সম্মুখ তল (Frontal)	দেহকে পৃষ্ঠীয়(পিঠ) ও অঙ্কীয়(বুক) অংশে ভাগ করে।
অনুপ্রস্থ তল (Transverse)	দেহকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশে ভাগ করে।

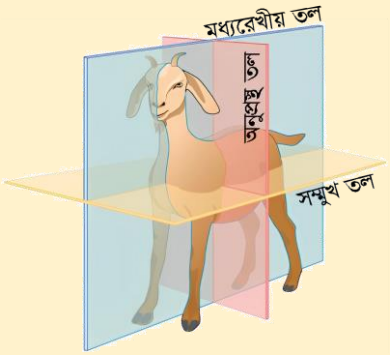

চিত্র: দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণিদেহের বিভিন্ন তল ও অক্ষ

প্রতিসাম্যতা

উপরের ছবির ঐ ছাগলটির দিকে একবার তাকাও তো। মধ্যরেখীয় (Sagittal) তলটির দিকে খেয়াল করো। মনে হচ্ছে না এই তল বরাবর যদি ছাগলটিকে দুইভাগে কেটে ফেলা হয় তবে বাহির থেকে এই দুই অংশ দেখতে একইরকম হবে। এই যে দেখেতে একইরকম হওয়া, এটিই হলো প্রতিসাম্যতা। উভয়পাশে সদৃশ অংশ থাকলে কোন বস্তু প্রতিসম হয়। এই যে তল দিয়ে এই সদৃশ অংশে ভাগ করা হয় তা প্রতিসাম্য তল। প্রতিসম্য তল বরাবর অংশ দুটি একে অপরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হবে। যেসব প্রাণীতে প্রতিসম তল থাকে তারা প্রতিসম প্রাণী। যাদের প্রতিসাম্য তল থাকে না তারা অপ্রতিসম প্রাণী। প্রতিসম তলের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাণিদেহে বিভিন্ন রকম প্রতিসাম্যতা দেখা যায়।

বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্য ও উদাহরণ:

প্রতিসাম্য	প্রতিসাম্য তল	উদাহরণ	ছবি
১। গোলীয় প্রতিসাম্য (Spherical Symmetry)	কেন্দ্রগামী যেকোন তল বরাবর সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়।	*Volvox globator* (ফটো সিন্থেটিক প্রোটিস্ট)। Radiolaria (*Acrosphaera trepanata*) এবং Heliozoa (*Gymnosphaera albida*)	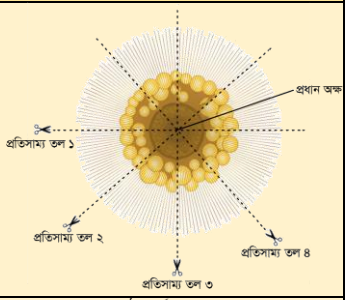
২। অরীয় প্রতিসাম্য (Radial Symmetry)	কেন্দ্রগামী লম্বঅক্ষ বরাবর (উপর থেকে নিচের দিকে গমনকারী অক্ষ, যা কেন্দ্রগামী) যেকোন তল বরাবর সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়।	হাইড্রা (*Hydra*), জেলিফিশ (*Aurelia*), সী অ্যানিমন (*Metridium*), স্টার ফিশ।	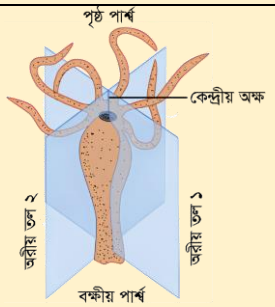
৩। দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য (Biradial Symmetry)	এক্ষেত্রে প্রাণিটিকে অরীয় প্রতিসাম্যের মতোই বিভক্ত করা যায় কিন্তু কেবল দুটি তলে। কোনো অঙ্গের সংখ্যা ১টি কিংবা ১ জোড়া হওয়ায় অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ বরাবর পরস্পর সমকোণে অতিক্রমকারী ২ টি তলে বিভাজনের ফলে ৪টি সদৃশ অংশে বিভক্ত করা যায়। (চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছো পরস্পর সমকোণে থাকা AB ও PQ তল আকৃতিটিকে সদৃশ চারটি অংশে ভাগ করেছে। অর্থাৎ আকৃতিটি দ্বিঅরীয় প্রতিসম।)	Ctenophora পর্বভুক্ত প্রাণী (যেমন: *Ceoloplana*)	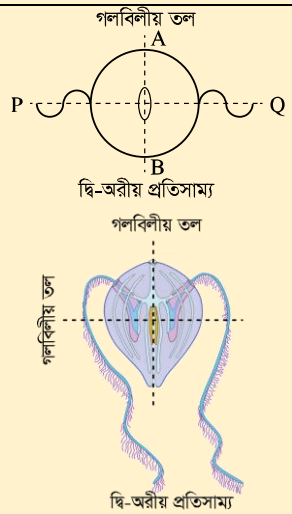
৪। দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral Symmetry)	কেন্দ্রগামী লম্বঅক্ষ বরাবর ১টি তল বরাবর সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়।	প্রজাপতি (*Pieris brassicae*), ব্যাঙ (*Fejervarya asmati*), মানুষ (*Homo sapiens*)	
৫। অপ্রতিসাম্য (Asymmetry)	কোন প্রতিসম তল নেই।	স্পঞ্জ (*Cliona celata*), আপেল শামুক (*Pila globosa*)	

ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ

যৌন জননক্ষম প্রাণীতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষেকের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি করে। জাইগোট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর পরিস্ফুটনের জন্য মাইটোসিস বিভাজন হয়। প্রাথমিকভাবে, জাইগোট এ দ্রুতগতির যে বিভাজনের দ্বারা একটি কোষ হতে একগুচ্ছ কোষ তৈরি হয় সেই বিভাজনকে ক্লিভেজ বলে। অর্থাৎ সহজকথায় **যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননকারী প্রাণীর এককোষী জাইগোট মাইটোসিস কোষ বিভক্তির মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য বহুকোষী ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে।** ক্লিভেজ দ্বারা প্রাথমিক বহুকোষী ভ্রূণ গঠিত হয়। পরবর্তী বিভাজনগুলো মন্থর এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়।

ক্লিভেজকে বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:

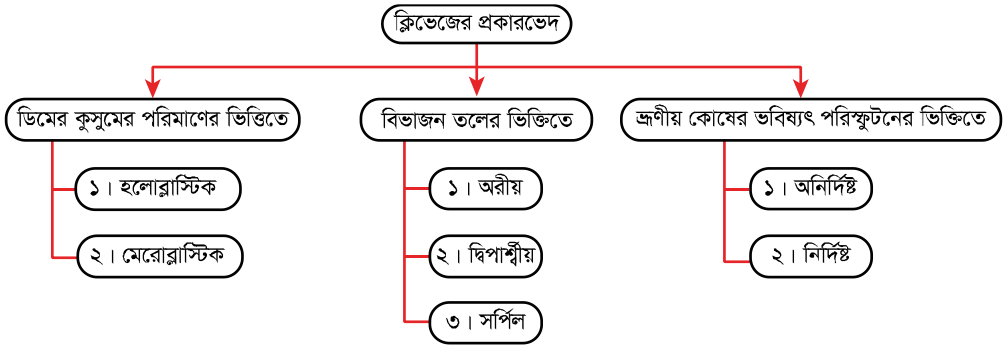

ডিমে (ডিম্বাণুতে) কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্লিভেজ ২ প্রকার। যথা:

(a) হলোব্লাস্টিক: যদি ডিমে কুসুমের পরিমাণ অল্প হয় তবে জাইগোটের এরকম ক্লিভেজ দেখা যায়। এক্ষেত্রে জাইগোটের সম্পূর্ণ বিভাজন ঘটে এবং ঐ ভ্রূণ মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি পেয়ে থাকে।
উদাহরণ: Amphibia, Mammalia, Echinodermata ইত্যাদি।

(b) মেরোব্লাস্টিক: যদি ডিমে কুসুমের পরিমাণ বেশি হয় তবে জাইগোটে এইরকম ক্লিভেজ দেখা যায়। এক্ষেত্রে ডিমের কুসুমে আংশিক বিভাজন ঘটে।
উদাহরণ: Reptilia, Aves ইত্যাদি।

ক্লিভেজের সময় জাইগোটের দুটি প্রান্ত থাকে:

- **অ্যানিমেল পোল:** ক্লিভেজের সময় ডিমের যে প্রান্তে নিউক্লিয়াস থাকে। অ্যানিমেল পোল অংশ থেকে মূলত ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।
- **ভেজিটাল পোল:** ক্লিভেজের সময় ডিমের যে প্রান্তে কুসুম থাকে। ভেজিটাল পোল ভ্রূণের পুষ্টি দেয়।

পাশের চিত্রটি খেয়াল করো । এক্ষেত্রে উপরে নীল রঙের যে অংশটি দেখতে পাচ্ছ তাই হলো অ্যানিমেল পোল কেননা ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসটি ঐ অংশে অবস্থান করছে। আর নিচের দিকে হলুদ অঞ্চলটিকে বলে ভেজিটাল পোল কেননা এতে আমরা কুসুমের আধিক্য দেখতে পাচ্ছি।

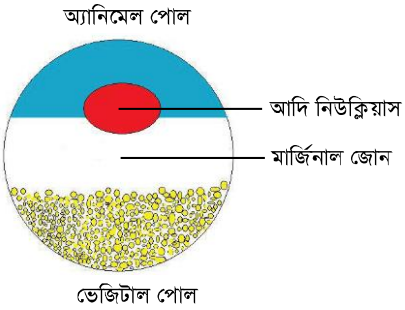

জেনে রাখো

কুসুম (Yolk): ডিম্বাণুর পুষ্টিসমৃদ্ধ যে অংশটি পরবর্তীতে ভ্রূণের বিকাশের সময় ভ্রূণের খাদ্যের যোগান দেয় তাই হলো কুসুম। সাধারণত যেসব প্রাণী ডিম পাড়ার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তাদের ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর ঐ কুসুমের বেশিরভাগ অংশই নিষেকের পরও ভ্রূণের সাথে থেকে যায়। আর অন্যদিকে যাদের ডিম উৎপাদিত হয় না তাদের ভ্রূণে এই কুসুমের পরিমাণ খুব সামান্য বা অনেক সময় থাকেই না, যার ফলে ঐ ভ্রূণ মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি পেয়ে থাকে (যেমন: মানুষ)।
বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত যেসব ডিম আমরা খাই সেগুলো মূলত মুরগীর অনিষিক্ত ডিম্বাণু। এই "ডিমের কুসুম"-ই কিন্তু এই যে কুসুম নিয়ে জানলে তাকে নির্দেশ করে।

ভ্রূণীয় কোষের ভবিষ্যত পরিস্ফুটনের ভিত্তিতে ক্লিভেজ দু'ধরনের। যথা:

(a) **অনির্দিষ্ট ক্লিভেজ (Indeterminate Cleavage):** যে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনে ক্লিভেজের প্রাথমিক ধাপে উৎপন্ন প্রতিটি কোষ একেকটি সম্পূর্ণ ভ্রূণ সৃষ্টির ক্ষমতা ধারণ করে সে ধরনের ক্লিভেজকে অনির্দিষ্ট ক্লিভেজ বলে। কেননা পরিস্ফুটনের পর কিসে পরিণত হবে তা নির্ধারিত না থাকলে এমনটি ঘটে।

উদাহরণ: Echinodermata, Vertebrata ইত্যাদি।

(b) **নির্দিষ্ট ক্লিভেজ (Determinate Cleavage):** যে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনে ক্লিভেজের প্রাথমিক ধাপেই উৎপন্ন প্রতিটি কোষের পরিস্ফুটনগত ভাগ্য (পরিস্ফুটনের পর কিসে পরিণত হবে) নির্ধারিত হয়ে যায় তাকে নির্দিষ্ট ক্লিভেজ বলে। কাজেই এক্ষেত্রে ঐ ব্লাস্টোমিয়ারগুলো আলাদাভাবে ভ্রূণে পরিণত হতে পারে না।

উদাহরণ: Annelids, Mollusks ইত্যাদি।

বিভাজন তলভেদে ক্লিভেজ আবার তিন রকম হতে পারে। যথা:

(a) **অরীয় ক্লিভেজ:** এক্ষেত্রে ক্লিভেজ সব তলে এমনভাবে হয়ে থাকে যেন সৃষ্ট ভ্রূণ অরীয় প্রতিসম হয়, অর্থাৎ ভ্রূণকে কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর যেকোন তলে কেটে দুইয়ের অধিক সমান অংশে ভাগ করা যায়। যেমন: Arthropoda.

(b) **দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ:** এক্ষেত্রে ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট ভ্রূণ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম হয়। এখন প্রথম দুটি ক্লিভেজ অরীয় ক্লিভেজের মত হয়। তৃতীয় ক্লিভেজের সময় চারটি কোষ দুটি সারিতে বিভক্ত হয় এবং দুসারিতে আলাদাভাবে বিভাজন ঘটে। ফলে ডান ও বাম দুপাশে সমন দুটি অংশ অর্থাৎ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা তৈরি হয়। যেমন: Chordata.

(c) **সর্পিল ক্লিভেজ:** এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্লিভেজের পর তৃতীয় ক্লিভেজের সময় কোষগুলোর অ্যানিমেল পোল এবং ভেজিটাল পোল পরস্পর স্থান বিনিময় করে। ফলে বিভাজন তলের দিক পরিবর্তন হয় এবং নতুন তলের সৃষ্টি হয়। চতুর্থ ক্লিভেজে পুনরায় অ্যানিমেল ও ভেজিটাল পোলের স্থান বিনিময় হয় ও বিভাজন তলের পুনরায় দিক পরিবর্তন হয়। এভাবে বিভাজন তলে পুনঃপুন দিক পরিবর্তনের দ্বারা যে ক্লিভেজ হয় তাকে সর্পিল ক্লিভেজ বলে। যেমন: Annelida, Mollusca।

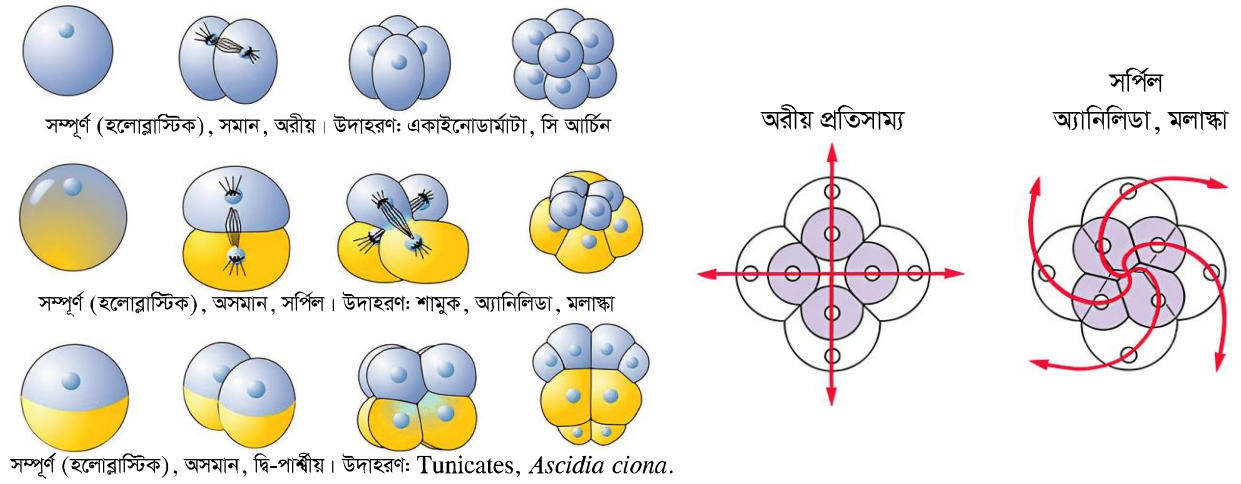

ভ্রূণস্তর

ভ্রূণ ও ভ্রূণস্তর: জাইগোট ক্লিভেজের মাধ্যমে কয়েকটি দশা পেরিয়ে ভ্রূণ তৈরি করে।

১ম দশা- মরুলা: ক্লিভেজের দ্বারা গঠিত ৬৪টি কোষের নিরেট গোলাকাকৃতি দশা। মরুলার প্রতিটি কোষকে বলা হয় ব্লাস্টোমিয়ার। আর এ ব্লাস্টোমিয়ারগুলো যে একটি স্তরে সাজানো থাকে তাকে বলে ব্লাস্টোডার্ম।

২য় দশা- ব্লাস্টুলা: মরুলার কোষগুলো একটি স্তরে সজ্জিত হয়ে ভিতরে ব্লাস্টোসিল (coel গহ্বর) নামক ফাঁকা গহ্বর সৃষ্টি করে। তখন ব্লাস্টোসিল সহ ফুটবলের মত গঠনটিকে বলা হয় ব্লাস্টোসিস্ট এবং দশাটিকে ব্লাস্টুলা।

৩য় দশা- গ্যাস্ট্রুলা: ব্লাস্টোসিস্ট গঠনের পর কোষগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুইটি বা তিনটি স্তর গঠন করে। স্তরগুলোকে ভ্রূণস্তর (Germ layer) বলে। এই দশাটিকে গ্যাস্ট্রুলা এবং ভ্রূণস্তর তৈরির প্রক্রিয়াকে বলে গ্যাস্ট্রুলেশন।

ভ্রূণ: সহজ কথায়, জাইগোট গঠনের পর থেকে বাচ্চা হবার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থায় এই বিভাজনরত জাইগোটকে বলা হয় ভ্রূণ। তাহলে, কোনো বহুকোষী জীবের জাইগোটের পরিস্ফুটনরত অবস্থাকে বলা হয় ভ্রূণ।

গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে ভ্রূণের কোষগুলো স্তরে বিভক্ত হয়, এই প্রক্রিয়াকে বলে গ্যাস্ট্রুলেশন।

এক্ষেত্রে তিনটি ভ্রূণস্তর গঠিত হতে পারে:

- এক্টোডার্ম: Ecto → বাইরে, Derm → ত্বক, সর্ববহিঃস্থ ভ্রূণস্তরটি এক্টোডার্ম।
- মেসোডার্ম: Meso → মাঝে, মাঝখানের ভ্রূণস্তর।
- এন্ডোডার্ম: Endo → ভিতরে, সবার ভেতরের ভ্রূণস্তর।

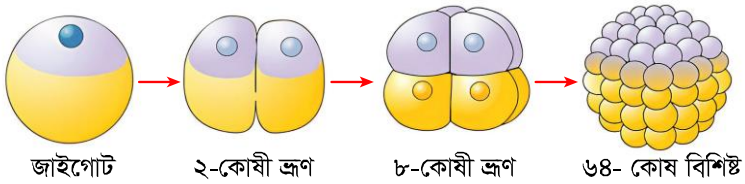

গ্যাস্ট্রুলেশন: আর্কেন্টেরন ও জার্ম লেয়ার গঠন

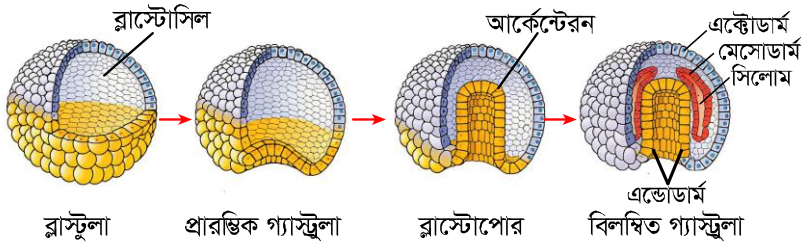

গ্যাস্ট্রুলেশন: মেসোডার্ম গঠন

প্রাণীদেহ ভ্রূণ কতস্তরে সাজানো থাকে তার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(a) দ্বিস্তরী / দ্বিভ্রূণস্তরী (Diploblastic)	শুধু কোষগুলো দুই স্তরে বাইরে ও ভিতরে সাজানো থাকে, অর্থাৎ শুধু এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম উপস্থিত।	Cnidaria
(b) ত্রিস্তরী / ত্রিভ্রূণস্তরী (Triploblastic)	কোষগুলো তিন স্তরে বাইরে, মাঝে ও ভিতরে সাজানো থাকে, অর্থাৎ এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম তিনটিই উপস্থিত।	Platyhelminthes থেকে Chordata পর্ব পর্যন্ত

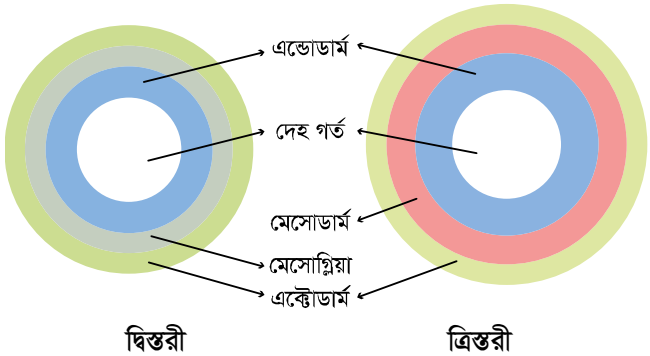

মেসোগ্লিয়া: দ্বিস্তরী প্রাণিদেহে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝে জেলির মত অকোষীয় (কোষ নয়) পদার্থ গঠিত একটি স্তর থাকে। একে মেসোগ্লিয়া বলে।